দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প

রূপান্তর : শামছুর রহমান ওমর
কানিস শারমিন সিঁথি

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আজ অবধি সে লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। তখন থেকে এখন, ইবলিসের তার মিশনে সদা তৎপর। জাহেলিয়াতের সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে মানুষদের ঈমানচ্যুত করার প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে। তবুও ইসলাম তার আপন মহিমায় ফুলেল সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলাম ঈমানদারদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে কেবল সুদৃঢ়ই করেনি; একইসাথে অবিশ্বাসীদের চিন্তার সাগরেও ঢেউ তুলেছে তুমুল বেগে। দুনিয়ার সকল তন্ত্র-মন্ত্র-আদর্শ ইসলামের পতাকাতলে লুটিয়ে পড়েছে অনিবার্যভাবে। আধুনিক সভ্যতার মোড়কে চাকচিক্যময় দুনিয়ার কৃত্রিম আলোকোজ্জ্বল উপস্থাপনাও জাহেলিয়াতকে রক্ষা করতে পারছে না। শান্তির সন্ধানে দিগ্‌ভ্রান্ত লাখো মুসাফির পরম আশ্রয় হিসেবে ইসলামের বর্মই পরিধান করছে। এ যেন মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত পথিকের শীতল পানির সন্ধান পাওয়া!

'*দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প*' বইয়ে আমরা এমনই তৃষ্ণার্ত ১৩ জন মানুষের ইসলামের পতাকাতলে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার গল্প পড়ব। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের ভাই-বোনদের হৃদয়ের হাহাকার দেখব। ইসলামের কোন সম্মোহনী শক্তি তাদের টেনে ধরল, কোন সে পরশপাথর তাদের হৃদয়কে বিগলিত করল, কী তাদের ইসলাম গ্রহণের মতো এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে স্পৃহা যোগাল- প্রতিটি গল্পে তার উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ। অবিশ্বাসীরা প্রতিটি গল্পের সাথে নিজেদের জীবনধারা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আমরা বিশ্বাসীরাও হৃদয় থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, জন্মসূত্রে কত মূল্যবান পরশমণি পেয়েছি।

সামছুর রহমান ওমর ও কানিজ শারমিন দম্পতিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। বইটি নিয়ে উভয়ই অনেক শ্রম দিয়েছেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পগুলো সাজিয়েছেন। এই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি প্রাণ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংস্কার থেকে হয় সংস্করণ।

মানুষ ঘর বানায়, বাড়ি বানায়। মনের মতো করে প্রাসাদ তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় সেই সব ইমারতের সংস্কার হয়। অঙ্গ সজ্জায় পরিবর্তন আসে। মানুষের রুচি বদলায়। সেইসাথে বদলায় বাড়ির কাঠামো।

বইয়ের ক্ষেত্রে হয় সংস্করণ। কোনো একটা সময়ে একটা বই লেখা হয়। কালে কালে তাতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। লেখক/প্রকাশক বইটাকে নতুন করে পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন। বাক্য বিন্যাস, যতি চিহ্নে পরিবর্তন আসে। ভুল-ত্রুটি শুদ্ধ করা হয়। অঙ্গ-সজ্জা, কাঠামোর খোলনলচেতে বদল আসে।

আলহামদুলিল্লাহ! *দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প* প্রকাশের পর আমরা পাঠকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। যারা বইটি পড়েছেন তারা তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন। অনেকে জানিয়েছেন, তাদের বাবা-মা, স্বামী কিংবা স্ত্রী দিন-রাত ভুলে বইটি পড়েছেন। অনেকে হারিয়ে যাওয়া বই পড়ার অভ্যাস ফিরে পেয়েছেন।

অনেকে কেঁদেছেন। ফিরে আসা মানুষদের গল্প পড়ে আপ্লুত হয়েছেন। নিজের আত্ম অনুসন্ধানে নতুন করে উৎসাহী হয়েছেন। স্রষ্টার পদতলে নুয়ে পড়েছেন সিজদায়। অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়।

অনুবাদক হিসেবে সাধারণ পাঠকের এই অভিব্যক্তি আমাদেরকেও ছুঁয়ে যায়। সাহস যোগায়, অনুপ্রাণিত করে। আগামী দিনগুলোতে আরও ভালো কিছু করার জন্য আমরা উৎসাহ খুঁজে পাই।

এই সংস্করণে আমরা চেষ্টা করেছি, বইটিকে আরও প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে তোলার জন্য। বেশ কিছু গল্পে বাক্য বিন্যাস ও যতিচিহ্নে পরিবর্তন এসেছে। 'পথহারা এক মুসাফির' গল্পে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গোটা একটা প্যারা বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'মক্কার পথে' 'এক পপস্টারের আত্মকাহিনি' 'MTV থেকে মক্কা' গল্পে নতুন করে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বইতে কিছু বানান বিভ্রাট ছিল। সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। সচেতন পাঠক আগের সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখলে পরিবর্তনগুলো টের পাবেন। আশা করি, বইটির এই সংস্করণ পাঠকের কাছে আগের চাইতে আরও বেশি সুখপাঠ্য মনে হবে।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করেন। এই বইয়ের লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাইকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আবৃত রাখেন।

লেখকের কথা

আপনাদের একটা গল্প শোনাই। আমাদের খুব প্রিয় একটা গল্প।

খলিফা মামুনের সময়ের ঘটনা।

দেশব্যাপী খরা চলছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধা ও দরিদ্রের মাঝে থেকে কঠিন সময় পার করছিলেন। তেমনি এক প্রত্যন্ত গ্রামের মরুচারী বেদুইন ঠিক করলেন, খলিফার সাথে দেখা করবেন। জানাবেন তার কষ্টের কথা।

যেই ভাবা সেই কাজ। বেদুইন যাত্রা শুরু করলেন রাজধানী বাগদাদের পথে। অনেক দূরের পথ। বাহন বলতে কিছুই নেই। একমাত্র পায়ে হাঁটাই সম্বল। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পথ চলতে চলতে বেদুইন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যতদূর চোখ যায়, পানির কোনো দেখা নেই। বেদুইন তবুও ক্লান্ত অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে সামনে চললেন। খলিফার দেখা যে তাকে পেতেই হবে।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর বেদুইন থমকে দাঁড়ালেন। এ কি! পানি দেখা যাচ্ছে না? বেদুইন দৌড়ে এলেন। এক জায়গায় এক গর্তে আসলেই পানি জমে আছে। তৃষ্ণার্ত বেদুইন দুহাতের আজলা ভরে চুক চুক করে সবটুকু পানি পান করলেন। আহা! এ যে অমৃত! এত মিষ্টি, এত চমৎকার পানি যে আর জীবনেও সে পায়নি।

বেদুইন মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালেন। তার মনে হলো, আল্লাহ অনেক মেহেরবান। এ পানি জান্নাতের না হয়ে পারেই না। আল্লাহ নিশ্চয় দয়া করে শুধু তার জন্যই এ পানি পাঠিয়েছেন। ভাবলেন, খলিফার কাছে যখন যাচ্ছি, তখন ওনার জন্য উপহারস্বরূপ এ জান্নাতের নেয়ামত নিয়ে যাই। খলিফা যা খুশি হবেন না!

বেদুইন সে পানি একপাত্রে ভরে হাজির হলেন রাজদরবারে। খলিফা খেয়াল করলেন, এই অপরিচিত লোকটি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছু বলছে না। বোধহয় সাহস করে উঠতে পারছে না।

খলিফা নিজ থেকেই তার পরিচয় জানতে চাইলেন। বেদুঈন তার পরিচয় জানালেন। তারপরে গর্বভরে বললেন, 'মহামান্য খলিফা! অভাবে পড়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। তবে আমি নিঃস্ব হলেও আপনার দরবারে একেবারে খালি হাতে আসিনি। আমি আপনার কাছে আসার সময় পথিমধ্যে এক জান্নাতি নেয়ামতের সন্ধান পেয়েছি। সে নেয়ামতের পানি আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। সে পানি এত মিষ্টি, এত চমৎকার...যার তুলনা পৃথিবীতে বিরল।'

খলিফা আগ্রহভরে সে পানি মুখে তুললেন। কয়েক চুমুক দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে বেদুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নিয়ে আসা পানি আসলেই অত্যন্ত মিষ্টি এবং খুব চমৎকার। এর তুলনা সত্যিই বিরল। তুমি যে এত কষ্ট করে আমার জন্য এই পানি নিয়ে এসেছ, আমি এই জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমাকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। তুমি তা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এখান থেকে বেরিয়ে আর সামনে যাওয়ার দরকার নেই।'

দরবারে উপস্থিত লোকজন তো অবাক। কী এমন মহামূল্যবান পানীয়, খলিফা যার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন! খলিফার দরবারে নিয়ম ছিল, কেউ কোনো খাবার জিনিস আনলে, খলিফা অন্যদেরকেও তা খেতে দেন। কিন্তু এই পানীয় খলিফা কাউকে খেতেও দিলেন না। আবার লোকটিকে বললেন, যেন সামনের দিকে না যায়। এসবের মানে কী?

লোকটি চলে যেতেই সবাই খলিফার কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

খলিফা এক গাল হেসে বললেন 'এই পানির মতো এত বিস্বাদ পানি আমি আমার জীবনেও খাইনি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। পথের মাঝে কোনো এক গর্তে হয়তো বৃষ্টির পানি জমেছিল। লোকটা সেই পানি আমার কাছে বয়ে নিয়ে এসেছে। বেচারা মরুভূমির মানুষ। সুপেয় পানি খুব একটা চোখে দেখেনি। পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তৃষ্ণার্ত ছিল। এ অবস্থায় এই পানি তার কাছে অমৃত মনে হয়েছে। সে আন্তরিকতা থেকেই আমার জন্য নিয়ে এসেছে। এখন আমি যদি আপনাদের কাউকে এই পানি খেতে দিতাম, তাহলে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যেত। শুধু শুধু মানুষটা সবার সামনে লজ্জা পেত। আমি তাকে নিষেধ করেছি, যাতে সে সামনে না এগোয়। কারণ, আর কিছুদূর গেলেই দজলা-ফোরাত। দজলা-ফোরাতের কাছে এই পানির স্বাদ তুচ্ছ। সে পানি পান করলে তার ভুল ভেঙে যেত। আমি চাইনি, লোকটা এক ধরনের অনুশোচনায় পুড়ুক। যেন তার এ অনুভূতি না হয়, হায় হায় আমি খলিফাকে কী দিয়ে এসেছি!'

আমরা যারা ইসলামকে জন্মসূত্রে পেয়েছি, আমরা এর মর্ম বুঝতে পারি না। কিন্তু যারা অমুসলিম পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন তারা বোঝেন 'ইসলাম' আল্লাহ তায়ালার কত বড়ো নেয়ামাত। তাদের অবস্থা মরুভূমির সেই তৃষ্ণার্ত মুসাফিরের মতো। তাদের হৃদয় অসীম তৃষ্ণায় শুষ্ক। প্রখর রৌদ্রে সুকোমল পানীয়ের মতোই 'ইসলাম' তাদের দেহ-মনে তৃপ্তি আনে। ইসলাম তাদের কাছে অনেক কষ্টে সাগর সেচে আনা মুক্তো দানার মতো। ঝলমলে উজ্জ্বল। যার জ্বলজ্বলে আলো, আঁধারের মাঝেও জ্বালে আলোর রেখা।

এই বইয়ে আমরা চেষ্টা করেছি ১৩ জন মানুষের কাহিনি তুলে আনতে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি... তারা এসেছেন একেকজন একেক ধর্ম থেকে। এদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এই বইয়ের কাহিনিগুলো বেশিরভাগই ইউটিউব থেকে সংগ্রহ করা। 'MTV থেকে মক্কা' ও 'মক্কার পথে' কাহিনি দুটো তাদের লেখা বই থেকে নির্বাচিত অংশের রূপান্তর। মুহাম্মাদ আমিরের কাহিনি লেখা হয়েছে কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল অবলম্বনে।

এই গল্পগুলোকে বই আকারে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-কে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনলাইনের পাঠক-পাঠিকাদের, যারা নিয়মিত আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। পরিশেষে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আমাদের মা-বাবার প্রতি, যাদের ঐকান্তিক প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে লেখালেখির জগতে আমাদের হাতেখড়ি হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের মা-বাবাকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ দান করেন। আমিন।

'দ্যা রিভার্টস'-এর প্রতিটি কাহিনিই মর্মস্পর্শী। প্রতিটি গল্পই আঁধার থেকে আলোর পথে ফেরার আনন্দে উদ্বেল। প্রতিটি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে জীবনের সঠিক মানে খুঁজে পাওয়ার আকুতি, ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনকে রাঙানোর পরিতৃপ্তি।

আসুন, তাদের মতো করেই আমরা জীবনকে সাজাই, জীবনকে রাঙাই।

'মুছে যাক সব হতাশা, কষ্ট, গ্লানি
চোখ জুড়ে থাক আশার চাহনি।'

সামছুর রহমান ওমর
কানিজ শারমিন সিঁথি
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সূচিপত্র

বন্দি থেকে মুসলিম ১৩
ইভন রিডলি

আমি ইউসুফ এস্টেস বলছি ৪৩
ইউসুফ এস্টেস

আসুন বলি 'আলহামদুলিল্লাহ' ৬০
লরেন বুথ

জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে ৬৮
আব্দুর রহিম গ্রিন

রহস্যময় কুরআন ৮৯
ড. জেফরি ল্যাং

বৌদ্ধ থেকে আলোর পথে ১০৩
হুসাইন ইয়ি

মসজিদ ভাঙা হাত আজ মসজিদ গড়ার কারিগর ১০৮
মুহাম্মাদ আামির

শৈলেশের গল্প ১২০
সালাহ উদ্দিন প্যাটেল

পথহারা এক মুসাফির ১৩০
ইউসুফ চেম্বারস

কমিউনিজমের হাত ধরে ১৪০
ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

মক্কার পথে ১৫৫
মুহাম্মাদ আসাদ

এক পপস্টারের আত্মকাহিনি ১৬৮
ইউসুফ ইসলাম

MTV থেকে মক্কা ১৭৫
ক্রিসটিন বেকার

বন্দি থেকে মুসলিম

ইভন রিডলি

এক

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর।

দিনটার কথা মনে হলেই এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দু-দুটো প্লেন এক এক করে ঢুকে গেল বিশাল টুইন টাওয়ারের পেটের ভেতর। ভোজবাজির মতো ধ্বসে পড়ল আকাশছোঁয়া দুটি টাওয়ার। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল অনেক মানুষ। এই ঘটনাই যে আমার জীবনটা এমন করে পালটে দেবে, তা কে জানত!

ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। আমার নাম 'ইভন রিডলি'। পেশায় সাংবাদিক। আমি তখন কাজ করতাম লন্ডনের '*সানডে এক্সপ্রেস*' পত্রিকায়।

আমাকে একজন ফোনে বলল, 'জলদি তোমার টিভি ছাড়ো। টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে। সব চ্যানেল ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে।' টিভিতে যা দেখলাম, তা নিজের চোখেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রথমটায় ভাবলাম, এটা বোধ হয় কোনো দুর্ঘটনা। কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি প্লেন সোজা ঢুকে গেল টাওয়ারে। নিমিষেই ধ্বসে পড়ল টুইন টাওয়ার, আমেরিকার অহংকার।

কিছু সময় পর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল– এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি ছিল পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা। আমি উপলব্ধি করলাম, পেশাগত কারণে খবর সংগ্রহের জন্য আমার খুব দ্রুতই নিউইয়র্ক যাওয়া উচিত।
কিন্তু আমেরিকাগামী সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার সীমান্ত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আমেরিকাতে ঢোকা এখন খুব কঠিন।

লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে তখন আমেরিকান মানুষদের ভিড়। নিজ দেশে স্বজনদের কাছে ফেরার জন্য সবাই ব্যাকুল। দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকেট দেওয়া হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় চার দিন পর আমি নিউইয়র্কগামী প্লেনের টিকিট পেলাম।

বোর্ডিং পাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় আমার সম্পাদকের ফোন এলো- 'রিডলি!'

আমি তাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, 'জানো, আমি টিকেট পেয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠতে যাচ্ছি।'

ওপারে কিছু সময়ের নীরবতা।

তারপর উত্তর এলো, 'রিডলি! আমাদের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তুমি সোজা পাকিস্তান চলে যাও। তারপর আফগানিস্তান।'

'কী!' আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। 'আফগানিস্তান?'

'হুম! ঘটনার শুরু আফগানিস্তান থেকে। সারা পৃথিবীর চোখ এখন সেদিকেই থাকবে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।' লাইনটা কেটে গেল।

আমার বাক্স বোঝাই শীতের কাপড়। আমি দাঁড়িয়ে আছি নিউইয়র্কগামী প্লেনের লাইনে। আমাকে কিনা এখন যেতে হবে মরুর দেশ আফগানিস্তানে। অবিশ্বাস্য!

কী আর করা! আমেরিকার টিকিট বাতিল করে দুবাইয়ের টিকিট কাটলাম। দুবাই হয়ে পৌঁছালাম পাকিস্তানে।

আফগানিস্তানের ভিসা পাওয়ার জন্য আমি তিন-তিনবার চেষ্টা চালালাম। ভিসা পেলাম না। অথচ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আফগানিস্তানে না গেলেই নয়। এখন উপায়?

বিবিসি'র সাংবাদিক জন থমসন এক অভিনব বুদ্ধি বের করল।

দুই

জন থমসন একদিন আমার কাছে এসে বলল, 'দেখ! আমি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছি।' জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই কালো বোরকায় ঢাকা। সামনে বিরাট এক মূর্তি, অথচ তাঁর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাৎক্ষণিক আমার মাথায় দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ভাবলাম, 'আরে এরকম বোরকা পরে তো আমিও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। তারপর ঢুকে যেতে পারি আফগানিস্তানে। জন থমসন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে, আমি কেন নয়?'

আমার দুই গাইডের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন জন্মসূত্রে আফগান। তাদের সাথে বসে দারুণ এক বুদ্ধি আঁটলাম। ঠিক হলো, আমরা বিয়ে বাড়ির লোক সাজব। আমি থাকব বোরকায় ঢাকা। তারপর কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি এমন ভাব করে ঢুকে পড়ব আফগানিস্তানে।

যেই ভাবা সেই কাজ।

একদিন আমরা পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের গাড়ি তখন চলছিল 'খাইবার পাস'[১] দিয়ে। খাইবার পাস পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গিরি উপত্যকা। দুপাশে পাহাড় আর সবুজ ভূমিঘেরা চমৎকার সব দৃশ্য। আমার ধারণাই ছিল না, খাইবার পাস এত বড়ো! আমি মনে করেছিলাম, এটার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ গজ হবে। আসলে এর দৈর্ঘ্য ৩৪ মাইল। ইস! কী বোকাই না ছিলাম আমি!

আমার মনে তখন চিন্তার ঝড়। আফগানিস্তান! না জানি সেখানকার মানুষগুলো কেমন? বুশ-ব্লেয়ারের ভাষায় সেখানে 'শয়তানের শাসন' চলছে। মহিলারা চরম নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত জীবনযাপন করছে। অধিকার বলতে তাদের কিছুই নেই। তালেবান শাসকেরা এতই খারাপ, ছোটো বাচ্চাদেরও ঘুড়ি উড়াতে দেয় না।

কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে যুদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ, সবচেয়ে গরিব দেশের ওপর হামলা চালাবে। না জানি সেখানকার মানুষগুলো কী ভাবছে?

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার রেশ কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ি থেমে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'[২]। একটু দূরেই আফগানিস্তান সীমান্ত।

আমরা দুরু-দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম চেকপোস্টের দিকে। ভয়াল দর্শন সব প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মাথায় পাগড়ি, ইয়া লম্বা আলখাল্লা, মুখে লম্বা দাড়ি। ভয়ংকর তাদের চাহনি। তাদের হাতের 'কালাশনিকভ' রাইফেল সূর্যের আলোয় চকচক করছে। আমার বুকের ভেতর তখন দুম দুম ড্রাম বাজছে। এতটাই জোরে যে, আমি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলাম হৃদপিণ্ডের আওয়াজ।

একবার মনে হলো উলটো দিকে ফিরে দৌড় দিই। কিন্তু তখন আর পেছন ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না।

অবাক কাণ্ড! ওরা আমার দিকে ভালো করে তাকালই না। একবারের জন্যেও না। হয়তো বিরাট বোরকার আড়ালে কোনো মহিলা ভেবেই। গাইডরা আমাকে ভিন্ন এক আফগান মহিলা বলে পরিচয় দিলো। ভুয়া একটি আইডি কার্ডও দেখাল।

একটু পরে গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমার তখন দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে চলে এলাম। পুরুষ শাসিত আফগানিস্তান... যা নিয়ে পাশ্চাত্যে দুর্নামের শেষ নেই।

আমরা এসে পৌঁছলাম 'জালালাবাদ'। এটা আফগানিস্তানের অন্যতম বড়ো এক শহর। একটা বড়ো মার্কেটের সামনে এসে গাড়ি থামালাম। দেখি, পুরুষেরা কাঁধে করে বাজারের বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে বেরুচ্ছে। ভাবলাম, 'বাহ, দারুণ তো! এখানে পুরুষেরা বাজার-সদাই করে। পাশ্চাত্যে তো শপিং মল থেকে বাজার-সদাই সবসময় আমাদের নারীদেরই করতে হয়।'

পরে জানলাম, এখানকার নিয়মকানুন খুব কড়া। মহিলারা মাহররম পুরুষ ছাড়া অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলতে পারে না। নিয়ম নেই। আমি বোরকায় ঢাকা অনেক মহিলাকেও দেখতে পেলাম । তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। সবার চেহারা কেমন হাসিখুশি। সবার মধ্যে সুখী সুখী ভাব। দুদিন পরে আমেরিকা উড়ে এসে এদের ঘাড়ে বোমা ফেলবে, সেটা নিয়ে এদের কোনো চিন্তাই নেই।

আমরা এলাম ছোটো একটা গ্রামে। তখন কী এক উপলক্ষ্যে সেখানে বেশ আনন্দ ফুর্তি চলছিল। গ্রামের লোকজন গাইডের কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইল। গাইড পশতু[৩] ভাষায় বিড়বিড় করে কী বলে গেল, আমি তার এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলাম না। তবে এতটুকু বুঝলাম, গাইডের উত্তর শুনে তারা মোটেও খুশি হয়নি। তারা ভাবছিল, চারদিকে এখন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। এর মধ্যে গাইড এক পশ্চিমা নারীকে নিয়ে এলো এখানে। ব্যাটার আক্কেল জ্ঞানটা কী শুনি!
তার ওপরে মোল্লা উমরের[৪] কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল– 'কোনো লোক পশ্চিমা বিদেশিকে সাহায্য করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে'। স্বভাবতই তারা গাইডের ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে ভয়ও পাচ্ছিল, না জানি কখন ধরা পড়ে যায়!

আফগানরা জাতিগতভাবে ফুর্তিবাজ ও হাসিখুশি। খুব বেশিক্ষণ মনমরা হয়ে থাকা এদের ধাতে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ভয় কমে এলো। দু-একজন মহিলা দোভাষীর মাধ্যমে আমার সাথে কথাও বলা শুরু করল।

বিশ বছর বয়সী এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে দুদিন পরে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, তোমার ভয় করছে না?'

বিরক্তিমাখা স্বরে সে উত্তর দিলো 'আর বলবেন না। আমার খুব রাগ লাগছে।'

আমি জানতে চাইলাম 'কেন?'

সে বলা শুরু করল, 'আমি ছিলাম নার্সিং ইনিস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক নার্স। বছর দুয়েক আগে তালেবানরা হঠাৎ করেই সে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলো। আমি চলে এলাম গ্রামে। ভেবে দেখুন, আজ যদি আমি ঠিকভাবে আমার প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারতাম, তাহলে এই যুদ্ধের সময় আমি কত কাজ করতে পারতাম! আহতদের সেবা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা....তা না, আমি এখন হাত-পা গুটিয়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে এসে পঁচে মরছি।'

কথার মাঝখানে এক বয়স্ক মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার চেহারায় তাচ্ছিল্য, দুহাত কোমরে রাখা। আমাকে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে জানতে চাইলেন, 'এই মেয়ে! তোমার ছেলেমেয়ে আছে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আছে। একটা মেয়ে।'

'মোটে একটা?'

'জি, মোটে একটা।'

তিনি আমার বুকের ওপর সজোরে একটা ধাক্কা মারলেন, 'তোমরা পশ্চিমা নারীরা আসলেই হতভাগা। তোমাদের বাচ্চা হয় মোটে একটা-দুইটা। আমাকে দেখ। আমার সন্তান মোট পনেরোজন। যুদ্ধের মাঠে যখন তোমাদের সব সৈন্য মারা যাবে, আমি তখনো একে একে সন্তান জন্ম দিতে থাকব।'

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, আফগান মহিলারা লাজুক লাজুক আর জড়সড় মাটির মূর্তি। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'বাপরে! এই যদি হয় মহিলার তেজ, তবে পুরুষেরা না জানি কেমন?'

আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, 'এই যে আমেরিকা এসে আপনাদের ওপর বোমা ফেলবে, আপনাদের ভয় করছে না?'

তিনি সমান তেজে উত্তর দিলেন, 'আসুক না আমেরিকান সৈন্য! এই গ্রামে যদি আসে, আর আমি যদি হাতের কাছে পাই, তবে জামা কাপড় ছিঁড়ে নিজ হাতে আমি ওদের শায়েস্তা করব।'

একটু শান্ত হয়ে তিনি আবার বললেন, 'দেখ! তোমাদের ওখানে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু তাতে আমাদের কী দোষ! এর জন্য আমেরিকানরা কেন আমাদের ওপর বোমা মারতে চাইছে? আমরা কি কিছু করেছি?'

আমি তখন মনে মনে ফুঁসছিলাম। 'কি! টুইন টাওয়ার হামলা এদের কাছে নেহায়েত একটা দুর্ঘটনা? যেখানে ছয় হাজারের অধিক মানুষ জ্বলে-পুড়ে মারা গেল, যেখানে সুবিশাল টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ল, প্রাণ বাঁচাতে একশো তলা থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় লাফিয়ে পড়ল... এত বড়ো ঘটনাকে এরা দুর্ঘটনা বলে কী করে?'

পরে ভেবে দেখলাম, আসলে এদের দোষ নেই। তালেবান শাসনে বিদেশি টিভি দেখা বারণ। এরা তো জানেই না সে দৃশ্য, সে ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল!

গ্রামে থাকতে থাকতে বিকেল হয়ে এলো। আমাদেরকে নিয়ে ভয়, উৎকণ্ঠা আবার মানুষগুলোর চেহারায় ফিরে এলো। অনেক বলে-কয়ে তাদের কাছ থেকে দু-চারটা ছবি নিলাম। বিদায় নিয়ে একটু এগোতেই দেখি, গ্রামের অদূরে গেইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুনতে পেলাম, পাকিস্তান তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে আসতেও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি একই অবস্থা।